স্বামী একটি গৃহপালিত জন্তু

তপনকুমার দাস

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

গৌ র চ ন্দ্রি কা

সেই গল্পটা মনে আছে নিশ্চয়ই?

সেই যে সেই রাজার গল্প। রানীর ভয়ে ভীত রাজা দরবারে বসে জানতে চাইলেন, তাঁর রাজ্যে কি এমন কোনও স্বামী আছে যে স্ত্রীকে ভয় পায় না? না মহারাজ, ঘাড়ে আমাদের অতো শক্ত মাথা নেই, উত্তরে জানিয়ে দেন সবাই। তবুও বিশ্বাস হয় না রাজার—একজন প্রজাও কি পাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। নিশ্চিত বিশ্বাসে রাজার পেয়াদা ট্যাড়া পিটিয়ে জড়ো করলো রাজ্যের তাবৎ স্বামীদের রাজময়দান প্রাঙ্গণে। উদ্দেশ্য ঘোষণা করে দিলো ঘোষক—উপস্থিত স্বামীদের মধ্যে যাঁরা স্ত্রীকে ভয় পান তাঁরা চলে যান ডানদিকে। যাঁরা ভয় পান না বাঁদিকে থাকুন। ঘোষণা করতে দেরী হলেও ছুটতে দেরী হলো না স্বামীদের। হৈ হৈ শব্দে মাঠ উজার করে স্বামীরা ছুটলেন ডানদিকে। দেখে শুনে হঠাৎ হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন রাজা—দেখেছ, একজন স্বামী অন্ততঃ পাওয়া গেছে, যার স্ত্রী-তে ভয় ডর নেই। সত্যিই তো! সবার চোখ ঠিকরে পড়ল বাঁদিকে উপস্থিত একমাত্র স্বামীটির প্রতি। আদেশ দিলেন রাজা, বুলাও স্বামী-জীকো! ইনাম দেও স্বর্ণমুদ্রামে! অতএব আহ্বান গেল স্বামীটির কাছে। সত্যিই তুমি ধন্য হে! বললেন রাজা, আমার রাজ্যের মান সম্মান বাঁচালে। তা বাপু, তুমি কি সত্যিই ভয় পাও না স্ত্রীকে? রাজার প্রশ্ন শুনে ফ্যালফেলে মাছের চোখ মেলে রাখেন স্বামীটি। সবাই যখন ডানদিকে গেল, তুমিই একমাত্র বাঁদিক মুখো হলে, বুঝিয়ে বললেন রাজা। আমি তো স্যার অতশত বুঝিনি, হাত জোড় করে মুখ খোলেন স্বামী, এখানে আসার আগে বউ আমার পইপই করে বলে দিলো যে, ব্যাটা মিনসে, খবরদার! সবাই যে দিকে যাবে, সেদিকে কিন্তু পা-ও মাড়াবে না। তাই তো আমি বাঁদিকে—

দাম্পত্য জীবনে দম দেওয়া পতিকূলের যতো অধিবাসী সবাই আমার বাঁ-দিকে। দিগ্‌বিদিক শূন্য হয়ে কর্ষণহীন বেঁচেবর্তে থাকার চেয়ে বাঁদিকে থাকাই শ্রেয়। দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন মেনে চলতে হবে যে! দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন প্রণয়ন করেছেন স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ 'স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসন' প্রয়োজন এবং এই আইন 'বিবাহিত পুরুষের উপর বিধান' খাটানোর জন্য। স্বামীর সংজ্ঞা কি? বঙ্কিম মতে ইংরাজীতে 'A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman.' বাংলায়—'কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।' দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনে ২(ক) ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।' উক্ত আইনানুসারে 'গোরু বাছুরও স্বামী নহে' কারণ 'তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য করিবার ক্ষমতা আছে।'

পদকর্তা জ্ঞানদাস আক্ষেপ করেছেন, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্দিলুঁ/অনলে পুড়িয়া গেল/অমিয়া সাগরে সিনান করিতে/সকলি গরল ভেল।' না বাপু, ছত্রে ছত্রে অতো আক্ষেপ না করে ছত্র-পতি হয়ে স্ত্রী-র ছত্র-ছায়ায় সুবোধ ছাত্র হয়ে থাকতে ক্ষতি কি? আইনের সংসারে অসীম ক্ষমতা যাঁরা অধিকার করে আছেন সেই অধিকারিনীদের অধিকারের উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে জ্যান্ত শহীদ হয়ে বেঁচে থাকার কি কোনও মানে হয় না। শহীদ বেদীতে তবুও বছরে কেউ না কেউ একবার মালা দেয় (সারা বছর কাকপক্ষী 'অ্যাঁ' করলেও)। ভালোবাসার দিনটির, ক্ষণটির জন্যে, অপেক্ষা করতে হয়—আক্ষেপ দূরে নিক্ষেপ করে। স্ত্রীদের ভূমিকা অগ্রণী। তা হোক না, ঈর্ষা করে লাভ কি? গুণের গুণ-নিধি ওঁরা। চাণক্য শ্লোকে তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ—"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।/ষড়গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্ট গুণঃ স্মৃতঃ।।" স্ত্রীরা আহারে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, কর্মে ছয় ও ভোগবাসনায় (পুরুষের চেয়ে) আটগুণ বেশি ক্ষমতার ধারক। সুতরাং ক্ষমতাবানের (স্ত্রীর) কৃপা ধন্য হয়ে জীবনধন্য করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি তো কিছু নেই। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি....।

যতীন্দ্রকুমার সেন যতোই বলুন না কেন—'পত্নী ও পেত্নী শুধু 'এ' কারেতে ভিন্ন/তবে পেত্নী কিছু রসিকা, পত্নী সদা খিন্ন!'—স্ত্রীর ভূমিকা কিন্তু অনস্বীকার্য। ভাবকের ভূমিকা, অভিভাবকের ভূমিকা তাঁর। চোখে চোখে নজরদারির কেউ একজন না থাকলে স্বামীর বাউন্ডুলে হতে কতোক্ষণ? মনুষ্য জীবনে স্ত্রী রত্নের বিকল্প ধারণ যোগ্য রত্ন নেই। 'স্বামী ও স্ত্রী' রতনে রতন। শুধু চিনে নিতে জানতে হয়। বুঝে নিতে বুঝতে হয়। নইলে ঠক্কর। আর ঠক্করের চক্করের মতো অমন রসালো কালমেঘ-রস কি আর পাওয়া যায়? চাণক্য শ্লোকেই বলা আছে—"সর্ব্বেষামেব রত্নানাং স্ত্রীরতং অনুত্তমম্।/তস্মাত্তদর্থনিরতস্তয়া ত্যক্তঃ ধনেন কিম্।।"—স্ত্রী রত্নই প্রধান, সুতরাং সেই রত্ন লাভে ব্রতী থাকা উচিত। স্ত্রীধন বিনা সব ধনই বিফল।

সংসারের যাবতীয় 'সার' স্ত্রী-র ভাণ্ডারে। সেই সার সঠিক পরিমাণে টবে (সং-এ) প্রয়োগ করলে তবেই না জীবনের গোলাপ প্রস্ফুটিত হবে। পদ্মপাতায় জলের বিন্দু। পাতাটি হচ্ছেন স্ত্রী। তাঁর বুকে জল বিন্দু—স্বামী টলমল টালমাটাল থাকবেন এটাই নিয়ম। দাম্পত্যের 'দাম' চুকাবেন পতিরা আর উপভোগ-এ অধিকার থাকবে পত্নীদের। প্রবাদ বাক্য তাই তো ধ্রুব—'সংসার সুন্দর হয় রমণীর গুণে'। আর গুণীজনেরা সর্বত্র পুজ্য (পূজ্যা?) এবং গ্রাহ্য (গ্রাহ্যা?)। দাম্পত্যে কলহ থাকলেও কোলাহল থাকে অনেক অনেক বেশি। কোলাহল মানেই তো আনন্দ, সুখ, উচ্ছ্বাস, আহ্লাদ। দাম্পত্যে জীবন সমর্পণ নিত্য-বৈচিত্র্যময়। যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয় রোজ। সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত। Gabriel Garcia Marquez বলেছেন, "The problem with marriage is that, it ends every night after making love, and it must be rebult every morning before breakfast."

দাম্পত্য জীবন ঘিরে টানাপোড়েন, চল দোলাচলের মহিমায় স্ত্রীর প্রভুত্ব বজায় রাখার বাসনা চিরন্তন। মুখ্য স্ত্রীর কাছে স্বামী গৌণ। স্বামীত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় স্বামীরা কিঞ্চিৎ প্রভু (স্ত্রী) ভক্ত হয়ে সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলে ক্ষতি কি? স্ত্রী ভক্ত এই লেখককে পথ বাতলেছিলেন আর এক ভীরু (স্ত্রী-ভয়ে!) সম্পাদক—শেখর আহমেদ। জায়গা দিয়েছিলেন তাঁর 'পত্রপাঠ'-এ (বিদায় না নেওয়ার নিমিত্তে)। এই বইয়ের প্রায় সব কয়টি লেখাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁকে বইটি উৎসর্গ করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি। নান্দনিকের সঞ্জয় ভদ্র বইটি প্রকাশ করেছিলেন ২০০৬-এ। নবকলেবরে বর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশে আমার ইচ্ছাপূরণ করেছেন ভ্রাতৃপ্রতিম সন্দীপ নায়ক। তাঁর সঙ্গে আমার 'ধন্যবাদ' বিনিময়ের সম্পর্ক নেই, তিনি তাঁর কর্ম করেছেন, ফলেও আমার অধিকার নেই।

বইটির প্রতি নানান আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমার গুণী বন্ধুমহল। দেবাশীষ দেব, অনুপ রায় বইটিকে অলংকৃত করেছেন চিত্র বিচিত্র বৈচিত্রে ভরিয়েছেন, প্রচ্ছদের পট এঁকেছেন। তাঁদের প্রতি ঋণ মনের ভাণ্ডারে তোলা আছে।

আমার দু-একজন পাঠক-পাঠিকা, যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেন, প্ররোচিত করেন, তর্জনী তুলে সমালোচনা করেন, আরও ভালো লিখতে আদেশ দেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর এই সুযোগ কলম ছাড়া করতে চাই না।

বইটি উদ্দেশ্য দাম্পত্য জীবনে রসের আস্বাদন সংগ্রহ করার চেষ্টা। হয়তো কোনও চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব মিশে গেছে—বাস্তবিক তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কাউকে আঘাত দেওয়া নয় বরং অনাবিল আনন্দে সেই আঘাতের প্রলেপ খোঁজাই বইটিতে প্রকাশিত গল্পগুলি ও প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। মিলনান্তক মিলে মিলমিশ করিয়ে দেওয়া। সে উদ্দেশ্য সফল হলে ধন্যবাদ না জানালেও ক্ষতি নেই কিন্তু অপারগতায় প্রাণ খুলে গালি দেবেন না প্লিজ।

নূতনপল্লী, খড়দহ
বইমেলা, ২০১১

সূ চি প ত্র

কলুর বলদ ৯
শখ আহ্লাদ ১৭
শাস্তি ২৪
দম্-পত্য ৩৪
কর্মফল ৪৩
বশে অবশে ৫০
স্বাধীনতা দিবস ৫৭
হেনস্থা ৬৭
বিশ্বাস অবিশ্বাস ৭৪
চাঁদের উদয় ৮৪
সং-সার ৯৪
স্বাধীনতাহীনতায় ১০৫
ভালোবাসা যারে কয় ১১৫
গন্ধ ১২৩
চাঁন্দুর মা চাঁন্দুর বাপ ১৩৩
কদমফুলের কদম ছাঁট ১৪০
বই-বাহকের বই-তরণী ১৫১
তুষের আগুন ১৬০
ঘর পর জঙ্গল ১৬৯
পাটকেল ১৮৩
স্বামী একটি গৃহপালিত জন্তু ১৯৫

কলুর বলদ

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা যায় কিন্তু রসগোল্লা গেলা যায় না। পটলচেরা না হোক, আকাশচেরা চোখের ফাটলে অমন বিদ্যুৎ ঝলসে থাকলে অনুরোধের তাবৎ লোভে লাগাম টানাটাই বাধ্য ছেলের সাধ্য হওয়া উচিত। না মশাই না, রসগোল্লা আপনার চিম্‌টেয় ধরা থাক—আমার পিঠে চিম্‌টির জ্বালা সইবার মতো অত পুরু চামড়া নেই।

—মা, বাবা আবার রসগোল্লা নিচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা মেয়ের মুখের খবরটা শুনেই রাজভোগ মুখে পোরা গালফোলা গোবিন্দ, থুড়ি, মামনের মায়ের চোখ দু'টো ফুলে ওঠে ড্যাবা ড্যাবা ধমকে।

—আপনি তো রসগোল্লা ভালোবাসেন। তাছাড়া ব্লাডসুগার কিংবা ডাইবিটিস যখন নেই—

আর ভালোবাসা! জিভ চুঁইয়ে ঝরে পড়া লোভের জল কঁৎ করে না গিলে উপ.য় কি। গৃহকর্তার আপ্যায়নে আন্তরিকতা যতই থাকুক ভালোবাসা এখন পরাধীন। শুকনো কাঠের ঢেঁকিতে শর্করা কম, তাই অনুরোধে গিলে ফেললেও রক্তে মধু সৃষ্টি করে মধুমেহ ঘটাবে না। কিন্তু রসগোল্লা? নৈব নৈব চ।

—ঠাকুরপো, প্লিজ! ওকে আর রসগোল্লা দেবেন না। পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে, এখন একটু সংযম করতে দিন।

অনুরোধ আন্তরিক নয়, মুণ্ডু চিবিয়ে খাওয়ার মধু মাখানো আদেশ। এমন সুন্দর কথা বলার ভঙ্গী দেখতে দেখতে তাপসের এক-একবার মনে হয়, সাধনা রাজনীতি করলেই তো পারতো। এমন স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরহিত চেতনা চৈতন্যের কোয়ালিটি, রাজনীতির মাধ্যমে জনসেবা করলে দেশের উন্নতি না হোক, নতুন কোনও অবনতি হত না।

—কি যে বলেন বৌদি! দাদার যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে আপনার কত?

যা! মুখ ফসকে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা ছুঁড়ে দিলে হতভাগাটা? মেয়েদের বয়েস নিয়ে কটাক্ষ? চুপ্‌সে গুম্‌রে মনের মাঝেই প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। মেয়েদের মন—কালবোশেখীর আকাশের মতো। ঈশান কোণ কালো করে

রাখলেও, তর্জন গর্জন করলেও শেষপর্যন্ত বর্ষণ হবে কি না—ভগবানের আবহাওয়া দপ্তরও অনুমান করতে কষ্ট পায়।

—আপনার কি মনে হয়? চাটনির বুকে ভেজানো পাঁপড় তো নয়, কড়্ মড়্ শব্দে হাড় চিবোয় সাধনা।

—না, মানে—এই একটু জোক করলাম আর কি! নিস্তার পাওয়ার অন্য উপায় খুঁজে না পেয়ে গদগদ হয় মিহির।

—তবু? ছাড়বার পাত্র নয় সাধনা। হরধনুর ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে—মনের ভিতরের ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দ্যাখোনি ভাব চেপে।

—কত আর হবে, তিরিশ?

—ওয়াক্! রসগোল্লার শেষ কুচি গলায় আটকে চোখ ঠিক্‌রে বেরোতে বাকি। বলে কি মিহির? মহিলা দেখলেই চনমনিয়ে উঠতে হবে? চকচকে রাখতে তেল ঢালতে হবে তেলা মাথায়! ঢাল, বাবা ঢাল। ক্ষতি নেই। কিন্তু তেল ঢালার পাত্রটাকে তো দ্যাখ।

—সাঁইত্রিশ। আমার তেরো, মায়ের যখন চল্লিশ বছর বয়েস—

—থাক তোমাকে আর বিন্যেস করতে হবে না। ঠোঁটে মাখানো জবা রঙ বাঁচিয়ে তর্জনী চুষে নিয়ে মামনর্কে ধমকে দেয় সাধনা। মিহিরের অনুমান উবছে পাক্কা সাত বছর বেমক্কা বাড়িয়ে দিলে কার না রাগ হয়?

—সে তো সার্টিফিকেটে লেখা ছিল। মজা করার ইচ্ছে হয় তাপসের।

—মানে? ঠিকুজি-কুষ্টি কিনা বিচার করেছিল তোমার মা? ভুলে গেলে? রাশি, গণ, নক্ষত্র? ভুলে গেলে সে সব কথা?—বেদেনী ঝাঁপির ঢাকনা খুলে ফোঁস করে ওঠে অভিযোগের সাপ।

—বাদ দিন ওসব কথা। মধ্যস্থতায় নামে মিহির, রান্নাবান্না সব ঠিক ছিল তো? আমাদের জানাশুনো ক্যাটারার। আরে গগনদা, আপনি তো কিছুই নিলেন না? না চিকেন, না পাব্‌দা—

কোনোমতে পাঁকাল মাছের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চার-চারটে রো ডিঙিয়ে মিহির সটান সট্‌কে যায় গগনদার সামনে। জোরে জোরে ছ'বার নিঃশ্বাস নিয়ে তবেই শান্তি।

—দ্যাখো, তোমাকে একদিন নিষেধ করেছি—

—কী? দাঁতের ফাঁকে টুথপিক চালান করে তাপস।

—আমি জানি! মুখের ভেতর হজমিগুলি নাচাতে নাচাতে নেচে ওঠে মামন।

—কী? কী জানিস? ট্যাক্সির জানলা দিয়ে পথের আলোয় নজর ছুঁড়ে দেয় সাধনা।

—ওই যে, বাবা যেন তোমার বয়স নিয়ে খোঁটা না দেয়। হাততালি দেওয়ার মতো চটাপট জানিয়ে দেয় মামন।

—তা যা বলেছিস, মেয়েকে সমর্থন করে তাপস, কোনদিন শুনবি, বলে দেবে, তুইও তোর মায়ের চেয়ে বয়েসে ছোট।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে মজা পায় তাপস। ঠ্যা ঠ্যা হেসে ওঠে গাড়ির ঝাঁকুনির সঙ্গে নিজের শরীর ঝাঁকিয়ে। সে হাসির সুরে সুর মেলায় ট্যাক্সির ড্রাইভারও।

—নিজের বউকে যারা সবার সামনে ছোট করে....

গজ্‌গজে রাগে নিজের বক্তব্যের খেই ধরে রাখতে পারে না সাধনা।

—আহ! বাবা, চুপ করবে? মা কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই রেগে যাচ্ছে। বিচারকের ভূমিকায় নেমে পড়ে মামন।

তুলসিদা ঠিকই বলেছিলেন—গাড়ির অন্ধকারের ভিতর কানের লতিতে হাত ছুঁইয়ে নেয় তাপস।

তুলসিদা মানে তুলসি ভট্টাচার্য। সেতার শেখাতেন। বিয়ের আগে বারো বছরেরও বেশি সময় তাপস সেতার শিখেছিল তুলসিদার কাছে। ব্যাচেলার না হয়েও ব্যাচেলারের মতো থাকতেন তুলসিদা। স্ত্রী-পুত্রদের ছেড়ে পাক্কা সাতবাড়ি তফাতে। সেদিন সেতারের ক্লাস ছিল না তাপসের। বিয়ের নিমন্ত্রণ সারতে কার্ড হাতে সাতসকালেই পৌঁছে গেছিল তুলসিদার দমদমের বাড়িতে। ছাত্র-ছাত্রীদের কারো বিয়ের ব্যাপার উঠলেই বিরক্ত হতেন তুলসিদা। তাপসের বিয়ের কার্ড হাতে নিয়েই তেড়ে এসেছিলেন রে রে শব্দে,—বিয়ে করছ? করো, পয়সা খরচ করে গুচ্ছের অশান্তি আর অসুখ কিনতে চাইছ? কেনো!

—অশান্তি? অসুখ? অবাক হওয়া মনের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল তাপসের।

—নয় তো কি? সেতারের কান মলে জুড়ির তারে সুর বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দিয়েছিলেন তুলসিদা,—অশান্তি? বুঝবে বছরখানেক পরে। এতদিন ঘুরতে ধম্মের ষাঁড় হয়ে, এবার ঘুরবে কলুর বলদের মতো। চাই চাই, নেই নেই, দাও দাও, করলে কেন, বললে কেন—এইসবই হবে ইমন, বিলাবল, খাম্বাজ, কানাড়ার সুর, গৎ। আর অসুখ? প্রথমে হাঁচি, তারপর পেটব্যথা, বুক ধড়ফড়, কোমরে যন্ত্রণা, অনিয়মিত মাসিকের গঞ্জনা, এ ডাক্তার ছেড়ে সে ডাক্তার। কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ ছেড়ে হিল্লিদিল্লি। ঘুরপাক আর ঘুরপাক খেতে খেতে, খেতে খেতে একদিন দেখবে অম্বল, বদহজম, মধুমেহ, হৃদবৈকল্য আর—

—কিন্তু...

—হ্যাঁ। তাই বলে কি আর কেউ বিয়ে করছে না? করছে। বিয়ে করেই বছর

ঘুরতে না ঘুরতেই দার্শনিক হয়ে উঠছে। জিজ্ঞেস করলে বলছে—এই তো জীবন। ঝগড়া মারামারি অশান্তির মরুভূমিতে মরীচিকা খুঁজছে। বিরাট নিঃশ্বাস ছেড়ে জানিয়েছিলেন তুলসিদা।

—ওসব জানি না। আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে। মা বারবার বলে দিয়েছেন। মিনতি করেছিল তাপস গুরুজির কাছে। তবু তাপসের বিয়েতে হাজির হননি তুলসিদা। পরে শুনিয়েছিলেন অজুহাত—একদম সময় পাইনি রে।

—বাবা কি ঘুমুলে? স্মৃতি-র পর্দার আড়ালে লুকিয়ে চুরিয়ে পুরোনো সে দিনের কথাকলি নিয়ে লোফালুফি খেলা শুরু করতে না করতেই হাঁড়ি ফাটানো চিৎকার মেলে দিল মামন।

—ঘুমাবে না? খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আছেটা কি? সাধে কি আর গণেশের মতো ভুঁড়ি হচ্ছে? মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দেয় মেয়ের মা।

হায় রে! চোখ বন্ধ করে পুরোনো সে দিনের কথা ভাববো তারও উপায় নেই? মনে মনে ভাবে তাপস। ধুস, চোখ মেলে রাখাই ভালো। কিন্তু কান? কান খোলা রাখার বড় জ্বালা। চোখ তবু খুলে রাখা যায়—কান খুললেই যত অশান্তি। কান যে কামানের মতো। বারুদ ঠেসে আগুন জ্বালায়। কানে ঠাসা বারুদের গোলা মুখ দিয়ে ছুঁড়লেই শুরু হয় সব অশান্তির গোল্লাছুট খেলা।

যাক বাবা। বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছনো গেছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মতো একজন একক সংখ্যার তৃতীয় পুরুষের সামনে মা-মেয়ের তুবড়ি প্রতিযোগিতার ফাঁদে মুরগী তো হতে হবে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে তাপস। কিন্তু দড়াম্ করে দরজা টপকে নামতে গিয়েই মুখ টপকে ঠিকরে পড়ে আর্তনাদ—আঁ।

—কী হল স্যার? মিটারের অঙ্ক পড়া ছেড়ে জানতে চায় ড্রাইভার।

—গর্তে পা—

—পড়বে না? চোখেও যে চালসে ধরেছে। কাঁথা সেলাই শাড়ির আঁচল ট্যাক্সির সিটে রেখে আধখানা বুকের বিজ্ঞাপন বাতাসে মেলে গজগজ করে পথে নামে সাধনা।

—পা ভাঙেনি তো? বাবার পাশে এসে দাঁড়ায় মামন।

—ভাঙাই উচিত। কতদিন বলেছি, মিউনিসিপ্যালিটি না করে—তুমি করো। পাড়ার কমিটি করুক। এক লরি ঝামা কিনে—

—মশা মারতে কামান দাগি আর কি! পায়ের যন্ত্রণা ভুলে হিপ-পকেটের ওয়ালেট ছোঁয় তাপস, —কত ভাই?

—দেখলেন ভাই? শুনলেন লোকটার কথা? নিজের বাড়ির সামনে গর্ত? ঝামা কিনে ভরাট করলে লাভটা কার হবে?

—এক লরি ঝামা কি হবে মাসিমা, এইটুকু তো মোটে গর্ত। দু'টো থান ইট চাপা দিলেই তো—

—থাক, আপনাকে আর ওকালতি করতে হবে না। খুব বোঝা গেছে। একটুকরো ঢিল জুটছে না—উনি শোনাচ্ছেন থান ইটের গল্প। এক ধমকে ড্রাইভারকে থামিয়ে দেয় সাধনা। রাগে ঝিমঝিম করে মগজের যতো কোষ। কত বড় সাহস। তাকে কি না বলে 'মাসিমা'? কেন, 'বৌদি' বলতে লজ্জা করে। ফুঁসে ওঠে মনে মনে। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়,—আয়, চলে আয়।

—ম্যাডাম খুব রাগী। তাই না স্যার?

কি আর উত্তর দেবে তাপস। ট্যাক্সি ড্রাইভারের এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাও করে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢোকে কোনওমতে।

ঘরে না আছে একদানা আর্ণিকা, না একটা ব্রুফেন ট্যাবলেট। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি দু'টো কৌটোই ভোঁ-ভাক্কা। হাবিজাবি ট্যাবলেটের ডাঁই। একটা পেনকিলার যদি ঘরে থাকে তখনই নানান ব্যথার কাতরানি শুরু হবে সাধনার। আচ্ছা, ওর পার্সটা খুলে দেখলে কেমন হয়? মনে মনে ভাবে তাপস। একটা-দু'টো ব্রুফেন মিললেও মিলতে পারে।

হ্যাঁ ঠিক, যা ভেবেছে তাই। গোড়ালির যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয় তাপস। বাব্বা, একেবারে ট্যাবলেটের চেন। চকাস্ করে ভেঙে নিতে না নিতেই ঘুমচোখ ঠেলে বিছানার ওপর থেকেই গর্জে ওঠে সাধনা,—তাই ভাবি, আমার ব্যাগের টাকাপয়সাগুলো কোথায় যায়। ঘরের চোরে—

—কি যা তা বকছ? প্রতিবাদ করে তাপস। ভরসা মামনের অনুপস্থিতি। সে তো গেছে ঠাম্মার কাছে শুতে।

—রাতদুপুরে আমার ব্যাগ হাতড়াচ্ছ কেন? তাপসের হঠাৎ প্রতিবাদে একটু যেন মুষড়ে পড়ে সাধনা।

—হাতড়াচ্ছি কি আর সাধে? হাতড়াচ্ছি যন্ত্রণায়। সব পেইনকিলারগুলো ব্যাগে ভরে রেখেছে। হাটুর যন্ত্রণায় গোঙায় তাপস।

—পেইনকিলার ব্যাগে ভরে রেখেছি আমি? তড়াক্ করে বিছানায় উঠে বসে সাধনা।

—নয় তো কী এগুলো? ট্যাবলেটের ফয়েল সাধনার ভাতঘুম তাড়ানো চোখের সামলে মেলে ধরে তাপস।

—তুমি খেয়েছ?